দেবদেউলে

তমলুক শহর ও দেবী বর্গভীমা

রাজর্ষি পাল

রাত্রি অপগতপ্রায়। পুব আকাশে সন্ধ্যাতারা সবে শুকতারারূপে দেখা দিয়েছে। ভোরের প্রথম আলোর রশ্মি এসে পড়েছে বড়মন্দিরের বিষ্ণুচক্রের উপর। আন্‌কো আলোর স্পর্শে ঘুম ভেঙেছে পাখিদের। মৃদু-মন্দ বাতাসের আলতো ছোঁয়ায় রূপনারায়ণের অঙ্গে লাগছে পুলক। বড় দেউলের বাইরের দেওয়ালে জেগে উঠছেন টেরাকোটার রামসীতা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, মূষিকবাহন গণেশ, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, কার্তিক, বীণাহস্তা সরস্বতী, শিব-দুর্গা, যুযুধান রামচন্দ্র ও মকরবাহিনী গঙ্গা। জেগে উঠছে যজ্ঞমন্দির, জগমোহন, নাটমন্দির। জাগছে তমলুক, জাগছেন মন্দিরাভ্যন্তরে পুরাধিষ্ঠাত্রী বিশ্ববিধাত্রী দেবী বর্গভীমা।

কত প্রাচীন যে এ-দেশ, কত সুপ্রাচীন এর আধ্যাত্মিক পরম্পরা তা ধারণা করা যায় না। গঙ্গার মোহনায় অবস্থান করে তাম্রলিপ্ত গঙ্গা-যমুনার সমৃদ্ধশালী জনপদগুলির পূর্বমুখী সামুদ্রিক বাণিজ্যকে নিপুণভাবে পরিচালনা করত। সাম্প্রতিককালে অবিভক্ত তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নাটশাল গ্রামে প্রস্তরীভূত হাড় ও হরিণশিঙের অস্ত্রশস্ত্র ও এদের উপর শিল্পকর্মযুক্ত প্রত্নসামগ্রী উদ্ধার হওয়ার ফলে এই সভ্যতার মূল আরও কয়েক হাজার বছর অতীতে প্রোথিত বলে বিশ্বাস হয়। স্বাধীন রাজ্য হিসাবে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ মহাভারতে ও পুরাণেও পাওয়া যায়। পাক-ভারত উপমহাদেশে গড়ে ওঠা সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িককালে এতদঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মিশর, গ্রিক ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অপরদিকে অন্তঃসলিলারূপে চিরপ্রবাহিনী হয়েছে তাম্রলিপ্তের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ফল্গুধারা। 'কপালমোচন' তীর্থ তাম্রলিপ্তে পুণ্যার্জনের আশায় পৌষসংক্রান্তির দিন হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়। রূপনারায়ণ থেকে প্রবাহিত শংকর আড়া খাল ও তৎসংলগ্ন ছোট বাঁধানো পুকুরে অবিরল চলে পুণ্যস্নান। কথিত, এই তীর্থে স্নান করে শিব দক্ষহত্যাজনিত পাপ থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন। স্মরণাতীত কাল থেকে এই বিশ্বাসে ভর করে মানুষ চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইৎ-সিঙ, তাওলিন প্রমুখ বৌদ্ধ তীর্থস্থান

'দানব ভিসুভিয়াস ও হারিয়ে যাওয়া পম্পেই'-লেখক রাজর্ষি পাল এবং এই প্রবন্ধের লেখক ভিন্ন ব্যক্তি।—সঃ

পরিদর্শনকালে তাম্রলিপ্তে আসেন। এঁরা অনেকেই দীর্ঘকাল এখানকার বৌদ্ধবিহারে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

প্রাচীন পুঁথি থেকে আরও জানা যায়, তাম্রলিপ্তের এক নাম ছিল 'বিষ্ণুগৃহ'—যা দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক হেমচন্দ্র সুরির অভিধান 'চিন্তামণি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তমলুক মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী তাম্রলিপ্তে সে-সময় অসংখ্য দেবমন্দির ছিল। প্রভাতে মঙ্গলারতি, সন্ধ্যায় শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, পাঠ, কথকতা, নামসংকীর্তন ও ভক্ত-ভগবানের সেবার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ধারাপথে এগিয়ে গেছে তমলুক। অনেক দেবালয়ই এখন কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে। কিন্তু কালকে কলন করে, অগণিত মানুষের অসংখ্য কামনা-বাসনা পূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, ভক্তের সরল বিশ্বাসে ও ভক্তির আকুলতায় আজও অশেষ মহিমায় মহিমান্বিতা অতি জাগ্রতা, এ-অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা।

দেবী চতুর্ভুজা, শায়িত শিবের উপরে দণ্ডায়মানা। দক্ষিণ হস্তদুটির উপরে খড়্গ ও নিচে ত্রিশূল। বাম হস্তদুটির উপরে খর্পর ও নিচে নরমুণ্ড। একটি কালো পাথরে দেবীমূর্তি খোদাই করা। দেবী নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকারে ভূষিতা। প্রভাতে-সন্ধ্যায় নিত্যপূজার সময় মন্দিরের আনাচে-কানাচে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে দেবীর ধ্যানমন্ত্র :

''কৃষ্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং
দক্ষিণে খড়্গশূলঞ্চ তীক্ষ্ণধারা দুরাসদম্;
বামে খর্পরমুণ্ডঞ্চ লোলজিহ্বাং ত্রিলোচনাং
ব্যাঘ্রচর্মপরিধানাং ভীমাদেবীং শবাসনাম্॥''

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীর এই 'ভীমা' নামটির উল্লেখ রয়েছে। সেখানে দেবী স্বয়ং ইন্দ্রাদিদেবতাগণের স্তবে পরিতুষ্টা হয়ে যুগে যুগে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থে তাঁর আবির্ভাবের অবশ্যম্ভাবিতা জানিয়ে আশ্বাস দিয়ে বলছেন :

''পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥''

—আবার যখন আমি হিমাচলে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মুনিদের ত্রাণের জন্য রাক্ষসবধ করব, তখন মুনিরা নত হয়ে আমার স্তব করবে। সেই রূপে আমি ভীমা দেবী নামে খ্যাত হব।

কেউ কেউ বলেন, বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত 'বজ্রভীমা' নাম্নী দেবীর নাম পরিবর্তিত হয়ে বর্গভীমা হয়েছে। আবার কারও মতে যে-মূর্তিপ্রতীকে দেবী নিত্য পূজিতা, সেখানে শিবের উপস্থিতির জন্যই 'বর্গ' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। 'বর্গ' শব্দ ব্যবহারের অর্থ একাধিক দেবদেবীর মিলিত প্রকাশ। আবার কারও বিশ্বাস, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ প্রদান করেন বলেই দেবীর নাম বর্গভীমা।

দেবী বর্গভীমার ইতিহাসকে জড়িয়ে পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র কিংবদন্তি। মহাভারতের যুগে তাম্রলিপ্তে যখন ময়ূরবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন, তখন ওই বংশের দ্বিতীয় রাজা তাম্রধ্বজের নিয়োজিত এক জেলে-বউ প্রত্যহ রাজপরিবারে মাছ সরবরাহ করত। একদিন বনের মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ রাস্তায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে রাজবাড়িতে আসার পথে সে জলে-ভরা একটি ছোট গর্ত দেখতে পায়। সেখান থেকে কিছুটা জল নিয়ে মাছের ঝুড়িতে দেওয়ামাত্রই মরা মাছগুলি জীবন্ত হয়ে উঠল। এই অলৌকিক ঘটনার কথা রাজার কানে গেলে তিনি একদিন জেলে-বউ সহ অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে স্থানটি দেখতে এলেন। কিন্তু এ কী! কোথায় গেল সেই গর্ত! তার জায়গায় রয়েছে একটি বেদি এবং তার উপরে এক অপূর্ব সুন্দর দেবীপ্রতিমা। দিব্য জ্যোতিতে স্থানটি উজ্জ্বল। রাজা তাম্রধ্বজ সেখানেই দেবীপূজার ব্যবস্থা করে দিলেন। বর্তমানে

সেই দেবীই বর্গভীমা নামে পূজিতা হয়ে চলেছেন।

হাজার হাজার বছরের ইতিহাস কখনও কখনও ব্যষ্টি মানুষের মগ্নচেতনায় একটু ভিন্ন রূপেও ধরা দেয়। ময়ূরবংশীয় চতুর্থ রাজা গরুড়ধ্বজ প্রত্যহ শোলমাছ খেতেন। এক জেলে তা সরবরাহ করত। একদিন জেলের পক্ষে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। জেলে কোনওক্রমে পালিয়ে এল জঙ্গলে। দেবী বর্গভীমা কৃপা করলেন তাকে। দেবী তাকে প্রচুর সংখ্যক শোলমাছ সংগ্রহ করে ও শুকিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন এবং নিয়ে যাওয়ার সময় একটি কূপ নির্দিষ্ট করে তার জল ছিটিয়ে দিতে বললেন। কী আশ্চর্য! ওই কূপের জল ছিটোতেই মরা শুকনো মাছগুলি জীবন্ত হয়ে উঠল। জেলে এইভাবে প্রতিদিনই সময়ে-অসময়ে রাজবাড়িতে শোলমাছ জোগান দিতে লাগল। এদিকে রাজার সন্দেহ বাড়ল। তিনি জোর করে জেলের কাছ থেকে ওই অলৌকিক কূপের সন্ধান জানলেন। ক্রুদ্ধা হলেন দেবী। তিনি একটি প্রস্তর মূর্তির প্রতীকে কুয়োর মুখে এমনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন যাতে কুয়োটি দেখা না যায়। রাজা তাঁর দলবল নিয়ে এসে কুয়োটি আর দেখতে পেলেন না, তার জায়গায় দেখলেন এক অভূতপূর্ব দেবীপ্রতিমা। রাজা দেবীর আবাসস্থল হিসেবে সেখানে একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দিলেন। তবে বর্তমান মন্দিরই সেই মন্দির কি না তা বলা যায় না।

দেবী বর্গভীমা

আজও অনেকের বিশ্বাস স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এই মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই বিশ্বাসের ভিত্তি এ-মন্দিরের অতি আশ্চর্য গঠনশৈলী। ঐতিহাসিক হান্টার এই মন্দিরটির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : এর গঠনশৈলীর নৈপুণ্য ও কৌশল আমাদের বিশেষভাবে চমৎকৃত করে। সুউচ্চ বুনিয়াদের উপর তিনভাঁজ দেওয়ালের দ্বারা মূল মন্দিরটি তৈরি। প্রথমে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি সমস্ত মন্দির এলাকার মাটির উপর বিছিয়ে তার উপর ইঁট ও পাথর দিয়ে গেঁথে ত্রিশ ফুট উঁচু বুনিয়াদ তৈরি করা হয়। এরই উপর মন্দিরের দেওয়ালের অবস্থিতি। তিনটি পৃথক দেওয়ালের সমষ্টিতেই মন্দিরের পূর্ণ দেওয়াল। মন্দিরটির উচ্চতা ষাট ফুট ও দেওয়ালের ভিতরে প্রস্থ নয় ফুট। মন্দিরটি গোল ছাদবিশিষ্ট। মন্দিরটি তৈরি করতে অনেক বড় বড় পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। যে-যুগে যন্ত্রের প্রয়োজন অজানা, সে-যুগে এত বড় বড় পাথর যে কী কৌশলে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হল তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। মন্দিরের এই গঠনকৌশল দেখেই বোধ করি তমলুকের মানুষ আজও বিশ্বাস করে যে এটি মনুষ্যনির্মিত হওয়া অসম্ভব।

দেবী বর্গভীমার প্রাচীনত্ব নিশ্চিত করে বলা শক্ত, কারণ দেবীর ধ্যানমন্ত্র কোনও প্রামাণ্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলিতে 'দিগ্‌বন্দনা' অংশে অতি শ্রদ্ধার

সঙ্গে দেবী বর্গভীমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

''গোকুলে গোমতীনামা তমলুকে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।''
(চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

''বন্দিব বেলার চণ্ডী ছাতনার বাসুলী
তমলুকের বর্গভীমা রায়খার কালী।''
(ধর্মমঙ্গল, মাণিকরাম চক্রবর্তী)

''তমলুকে বন্দিয়া গাহিব বর্গভীমা
মাঘ মাসে মকরে আনন্দে নাঞি সীমা।''
(ধর্মমঙ্গল, রূপরাম চক্রবর্তী)

মধ্যযুগীয় একটি কিংবদন্তিতে পাওয়া যায়, ধনপতি সওদাগর একসময় রূপনারায়ণের উপর দিয়ে বাণিজ্যতরী নিয়ে সিংহলের উদ্দেশে যাত্রা করার সময় একবার তমলুকে নোঙর করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ করেন একজন লোক একটি সোনার কলসি নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী সওদাগর জানতে চান সে অত সুন্দর সোনার কলসিটি কোথা থেকে পেল। লোকটি তখন এক বিস্ময়কর কাহিনি বলে। জঙ্গলের মধ্যে একটি অতি আশ্চর্যজনক কুয়ো আছে, সেখানকার জলে পেতলের পাত্র ডোবালেই সোনা হয়ে যায়। ধনপতি ব্যবসায়ী সেই লোকটির কাছ থেকে কুয়োর সন্ধান নিয়ে নিলেন। তারপর তিনি তমলুকের বাজার থেকে যথেচ্ছ পেতলের পাত্র কিনে নিয়ে সেগুলি ওই কুয়োর জলে ডোবালেন। সব পাত্রই সোনার হয়ে গেল। সমস্ত সোনার পাত্র নিয়ে তিনি সিংহল যাত্রা করলেন এবং সেখানে অজস্র অর্থলাভ করলেন, যা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। ফেরার সময় তমলুকের সেই আশ্চর্য কুয়োর কথা মনে পড়ল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে তিনি সেই আশ্চর্য কুয়োর উপরেই দেবী বর্গভীমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেকের বিশ্বাস, বর্তমান মন্দিরই সেই মন্দিরের পরিবর্তিত রূপ।

বহু মানুষের বিশ্বাস, শিবপত্নী সতীর বামগুল্‌ফ এখানে পতিত হওয়ায় স্থানটি একান্ন পীঠের অন্যতম একটি পীঠ হিসেবে চিরপবিত্র। এই শক্তিপীঠের আরাধ্যা দেবী বর্গভীমা। কিন্তু এই তথ্যের ঐতিহাসিকতা প্রতিষ্ঠিত নয়।

দেবীর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তিনটি বহুল প্রচলিত জনশ্রুতি রয়েছে। একটি এইরকম : আফগান রাজা সুলেমান কররানির সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। তিনি ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান। তাঁর ধ্বংসলীলায় বহু হিন্দুমন্দির ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সেই কালাপাহাড় একবার ওড়িশা অভিযানের সময় তমলুকে এসে উপস্থিত হন। যে-কালাপাহাড় হিন্দুমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসের উন্মাদনায় মত্ত তিনি বর্গভীমার মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ, অভিভূত। এক আশ্চর্য ভাবান্তর হল তাঁর। তিনি বাদশাহি পাঞ্জার উপরে নিজের হাতের ছাপ দিয়ে দেবী যে অতি জাগ্রতা তা স্বীকার করে নিলেন। কালাপাহাড়ের তমলুকে আগমন ও তাঁর দ্বারা দেবীমাহাত্ম্যের স্বীকৃতিকে নিছক জনশ্রুতি বলে উপেক্ষা করা চলে না; কারণ পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও অন্যান্য তথ্য থেকে এর সত্যতা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয়টি : আঠারো শতকের প্রথমে মারাঠারা যখন নিম্ন বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে ব্যস্ত, তখন তারা যে-পথ দিয়ে যাতায়াত করত, সে-পথের ধারের গ্রাম, শহর, শস্যক্ষেত্রকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যেত। কিন্তু কী এক অজানা রহস্যে তারা যখন তমলুকে উপস্থিত হত, তখন ধ্বংস করা দূরে থাক, দেবী বর্গভীমার উদ্দেশে ষোড়শোপচারে পূজা নিবেদন করত এবং বহু মূল্যবান রত্নালংকার ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেবীর সেবায় উৎসর্গ করে যেত।

তৃতীয় জনশ্রুতি, প্রতি বছরই অবিশ্রান্ত বর্ষায় উত্তাল রূপনারায়ণ নদ তার প্রবাহধারাকে বর্গভীমা মন্দিরের কাছাকাছি এসে থামাতে বাধ্য হত। মন্দিরের পাঁচ গজের মধ্যে একসময় নদের

জলধারা এসে পৌঁছলে মন্দিরকে নদ গ্রাস করবে, এই আশঙ্কা করে পুরোহিতগণ মন্দির ত্যাগ করে পালিয়ে যান। কিন্তু মন্দিরের কাছাকাছি এসেই বিক্ষুব্ধ রূপনারায়ণ শান্ত হয়ে গেল। মা যেন রোষকষায়িত কটাক্ষে দুরন্ত ছেলেকে শান্ত করলেন। রক্ষা পেল মন্দির ও তমলুকবাসী।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত-ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ তাদের অজস্র মনস্কামনার ভার নিয়ে এসে দাঁড়ায় মায়ের মন্দির-দ্বারে। সন্তানদাত্রী হিসেবে দেবী বর্গভীমার মাহাত্ম্য সত্যই বিস্ময়কর। বন্ধ্যা নারীরা মায়ের কাছে সন্তান কামনা করে পুজো দেন, মন্দিরসংলগ্ন পুকুরে স্নান করেন। স্নান করতে গিয়ে ডুব দিয়ে হাতের কাছে মাটিতে যা স্পর্শ করেন, তা নিয়ে উপরে এসে একটি সুতো বা দড়িতে বেঁধে মন্দিরসংলগ্ন একটি সাদা গুলঞ্চফুলের গাছে ঝুলিয়ে দেন। ওইসময় দেবীর উদ্দেশে তাঁরা মানত ও প্রার্থনা করেন যেন তাঁরা সন্তানবতী হতে পারেন। সন্তান জন্মলাভ করলে তাঁরা এসে দেবীর উদ্দেশে পূজা নিবেদন করেন। ওইসময় সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করার প্রথাও চলে আসছে বহু বছর ধরে।

দেবী বর্গভীমার পূজা কেবলমাত্র তমলুক শহরেই সীমাবদ্ধ নয়, বহু দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ দেবীর মাহাত্ম্য শুনে পুজো দিতে আসেন। দেবী যে পরম জাগ্রতা ও ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুস্বরূপা, সে-বিষয়ে প্রমাণের অভাব নেই।

বহু পূর্বের ঘটনা। তখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সল্ট লেক এজেন্সি এখানে ছিল। বর্গভীমা মন্দিরের নিচের রাস্তায় রামকৃষ্ণ মান্নার সন্দেশ-বাতাসার দোকান ছিল। সেই সময় সল্ট কোম্পানির নায়েব তাঁর নাতির অন্নপ্রাশনার্থে দশ মণ সন্দেশের বায়না দেন। সন্দেশ তৈরি শেষ। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল—অন্নপ্রাশন হবে না, সন্দেশ চাই না। মান্নামশায় দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। এত টাকার সন্দেশ কী হবে! বর্গভীমা মন্দিরে গিয়ে মায়ের চরণে ধরনা দিয়ে পড়লেন। প্রার্থনা করলেন, ''মা, আমি গরিব লোক। এত সন্দেশ করলাম, সব যে নষ্ট হয়ে গেল, মা তুমি কৃপা করো।'' রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে দেবীকণ্ঠে শুনলেন, ''তোর ভয় নেই।'' পরদিন সকালে সন্দেশ নিতে নায়েবের লোক এসে হাজির। মান্নামশায় সেই সন্দেশ বিক্রয়ের অর্থে দেবীমূর্তির গলায় সোনার মুণ্ডমালা তৈরি করিয়ে দেন। দেবীর স্বর্ণকলস ও গহনাপত্র অনেকবার চুরি হয়ে গেলেও মুণ্ডমালা কখনও চুরি যায়নি। মান্নামশায় আদেশ দিয়ে গেছেন, যদি কোনওদিন মুণ্ডমালা চুরি যায়, তাঁর বংশধররা তা আবার যেন পুনর্নির্মাণ করে দেন।

গবেষক-লেখক ড. প্রদ্যোতকুমার মাইতি জানিয়েছেন, তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পাঁচ-ছ বছরের ছেলে দীর্ঘকাল অসুখে ভুগতে থাকে। চিকিৎসার ত্রুটি নেই, কিন্তু ফল কিছুই পাওয়া গেল না। বিচলিত পিতা গুরুদেবের শরণাপন্ন হলেন। তাঁর পরামর্শমতো মা বর্গভীমার কাছে পূজা দিয়ে পূজার ডালি অসুস্থ সন্তানের মাথায় স্পর্শ করালেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠল।

কোন স্মরণাতীত কাল থেকে দেবী বর্গভীমা জীবের কল্যাণ করে চলেছেন। তিনি আজও করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর অগণিত সন্তানের দিকে—কবে তিনি তাদের জাগতিক মালিন্য ধুইয়ে মুছিয়ে পরম প্রসন্নতায় আবার কোলে তুলে নেবেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১। প্রদ্যোতকুমার মাইতি, *তাম্রলিপ্ত—তমলুকের সমাজ ও সংস্কৃতি*

২। N.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol III, London : 1875

৩। প্রদ্যোতকুমার মাইতি, *ইতিহাস ও কিংবদন্তীতে দেবী বর্গভীমা* (পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ২০১৫)